ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

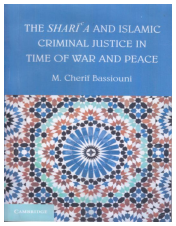

বুক রিভিউ

The Sharia and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace

(শান্তি ও সংঘাতে শরীয়া এবং ইসলামী দণ্ডবিধির ভূমিকা)

লেখক : এম. শরীফ বাসিউনি, স্কুল অব ল, ডি'পল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৩২, এভিনিউ অব দি অ্যামেরিকাস, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৩-২৪৭৩, ইউএসএ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৮৫

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (Human Right Law, IHL) এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন (Humanitarian Law, HRL) মানবসমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং জীবন ও সম্পদ রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। মানবাধিকার মানুষের নৈতিক নীতি বা আদর্শের নাম। মানবাধিকার মানুষের আচরণের বিশেষ আদর্শ অর্থাৎ কিভাবে ও কী ধরনের আচরণ করা উচিত তা নির্দিষ্ট করে দেয়। মানবাধিকার সর্বদা মানুষের মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলে বিবেচিত এবং দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে আইনগত অধিকার হিসেবেও সর্বদা সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যে কোন মানুষ কেবল একজন মানুষ হিসেবে এ সব অধিকার তার সহজাত, অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক অধিকার হিসেবে ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। এ সব অধিকার জাতি-ধর্ম-নৃতাত্ত্বিক উৎস-ভাষা-স্থান বা অন্য যে কোন অবস্থা নির্বিশেষে সব মানুষের সহজাত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সর্বজনীন অধিকার হিসেবে মানবাধিকার যে কোন সময় যে কোন স্থানে কার্যকর বলে বিবেচিত। 'সবার জন্য সমতা'র নীতির ভিত্তিতে এ সব অধিকার সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে এ সব অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করার জন্য আইনের শাসন এবং সকলের প্রতি সমানানুভূতি থাকা জরুরি। পাশাপাশি এর জন্য এমন একটি পরিবেশ প্রয়োজন, যেখানে সকলেই অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বা করতে বাধ্য থাকে। এ সব অধিকার ভোগ থেকে কাউকে বঞ্চিতও করা যাবে না।[১]

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ ও সহায়তা সংক্রান্ত আইন (International Humanitarian Law, IHRL) কতগুলো বিধির সমষ্টি। এ

১. http://en.wikipedia.com/wiki/Due_process

সব বিধি সশস্ত্র সংঘাতের ফলাফল বা প্রভাবকে মানবিক স্বার্থে সীমিত রাখতে চায়। যারা শত্রুতা বা সংঘাতমূলক আচরণে (Hostilities) অংশ নেয়নি বা পূর্বে অংশগ্রহণ করলেও তাতে জড়িত থাকতে চায় না এ আইন তাদেরকে রক্ষা করতে চায়। উপরন্তু এ ধরনের আইন যুদ্ধাচরণের উপায় ও পদ্ধতিগুলোকে সীমিত করতে চায়। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন 'যুদ্ধের আইন' বা 'সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত আইন' (Law of armed conflict) হিসেবেও পরিচিত। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন আন্তর্জাতিক আইনেরই অংশ; আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক নির্ধারণের বিধির সমষ্টি। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হয়। তবে এ আইন কোন রাষ্ট্র তার শক্তি ব্যবহার করতে পারবে কি না তা নিয়ন্ত্রণ (Regulate) করে না; সেই কাজটি বরং আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ করে থাকে, যা জাতিসংঘ সনদেরই অংশ। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনের চারটি ধারায় পাওয়া যাবে। এ আইন জেনেভা কনভেনশন পরবর্তী আরো দু'ধরনের চুক্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে- যার একটি হচ্ছে যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য আনীত ১৯৭৭ সনের অতিরিক্ত প্রটোকল এবং বিশেষ কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ কৌশল নিষিদ্ধকরণ এবং বিশেষ কিছু জনগোষ্ঠী ও সম্পদের সুরক্ষা দেয়া সংক্রান্ত প্রটোকলসমূহ।[২] আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন মানবিক বোধ থেকে উৎসারিত এবং মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। 'এটি কতগুলো বিধির সমষ্টি, যেগুলো বিভিন্ন চুক্তি বা প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে; উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ ও সম্পদকে সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা; উপরন্তু সংঘাতে লিপ্ত দু'পক্ষের ইচ্ছেমত যুদ্ধের উপায় ও মাধ্যম এবং পদ্ধতি ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা'।[৩]

এ ভূমিকা আলোচনার পর মূল আলোচনা শুরু করা যায়। এম. শরীফ বাসিউনি ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ শান্তি ও সংঘাতে, বিশেষত সংঘাত-উত্তর এবং অন্তর্বর্তীকালীন (Transitional) বিচারপ্রক্রিয়ায়[৪] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং আন্তর্জাতিক

২. ১৯৫৪ সনের সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষা সনদ, ১৯৯৩ সনের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সনদ, ১৯৯৭ সনের এন্টি পারসোন্যাল মাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ সংক্রান্ত অটোয়া সনদ এবং যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের জড়ানো সংক্রান্ত শিশু অধিকার সনদ বিষয়ক ২০০০ সনের ঐচ্ছিক প্রটোকল ইত্যাদি। ICRC, Advisory Service, On International Humanitarian Law, What is IHL, pdf, https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ what_is_ihl.pdf

৩. ICRC, Advisory Service, On International Humanitarian Law, What is IHL, pdf, https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdfGএবং https://en.wikipedia.org/wiki/International_humanitarian_law

৪. Transitional justice, বা অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা বিচারিক ও অবিচারিক (judicial and non-judicial) এমন কিছু পদক্ষেপকে বলা হয়, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার

মানবিক আচরণ আইন এবং এর সাথে ইসলামের অপরাধ আইনের ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধমালা তৈরি করেছেন। এ সব প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থটি সৃষ্টির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে। তবে গ্রন্থটি প্রধানত জনাব শরীফ বাসিউনির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

এম. শরীফ বাসিউনি একজন মিসরীয়-আমেরিকান মুসলিম। তিনি শিকাগোর ডি' পল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল'-এর প্রফেসর এ্যামেরিটাস। তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং ইটালীস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ ইন ক্রিমিনাল স্যায়েন্সেস-এরও সভাপতি। জনাব শরীফ বাসিউনি আলোচ্য গ্রন্থটি লিখেছেন সাম্প্রতিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, যার পরস্পর বিরোধী দু'টি দিক সবিশেষ লক্ষণীয়। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশের সহিংস তৎপরতা এবং তার প্রতি কিছু কিছু মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের সমালোচনা ও প্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি পাশ্চাত্যের ইসলাম ফোবিয়ারও সমালোচনা করেছেন, যারা কিছু মুসলিমের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণে একে ভিত্তি করে গোটা ইসলাম ধর্মকে খাটো করতে চায়।

"শান্তি ও সংঘাতে শরী'আহ এবং ইসলামী দণ্ডবিধির ভূমিকা" শীর্ষক এ গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সশস্ত্র সংঘাতের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে ক্ল্যাসিক্যাল সুন্নী মুসলিম আইনি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন। গ্রন্থটিতে লেখক বলেছেন, ইসলামের দণ্ডবিধি বা অপরাধ আইন সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা বিষয়ক (Humanitarian) আইনের আদর্শের সাথে কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, একই সাথে এ আইন মুসলিম জাতিগুলোর জন্য ব্যবহার উপযোগীও। তিনি এ গ্রন্থের মাধ্যমে সংঘাত ও এর থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং পাশ্চাত্য সমাজ, উভয়ের উপলব্ধিতে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দুই সভ্যতার মাঝে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ও বিরোধ কমিয়ে আনার দিক নিদেশনা দিয়েছেন বলে গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিকারের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় (redress legacies of human rights abuses)| যেমন, ট্রুথ কমিশন, আইনগত প্রক্রিয়া (criminal prosecutions), ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রভৃতি। সহিংস ও নিবর্তনমূলক অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাকালীন একটি রাজনৈতিক অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে Transitional justice এর উদ্যোগ নেয়া হয়। https://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_justice

গ্রন্থটি একটি ভূমিকা এবং পাঁচটি অধ্যায় ও প্রতিটি অধ্যায় অনেকগুলো উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় পাঁচটি হচ্ছে,

১. শরী'আহ, ইসলামী আইন (ফিক্‌হ) এবং আইনের মূলনীতিবিজ্ঞান (ইলমে উসূলে ফিক্‌হ[৫]);
২. ইসলামে মানবাধিকারের মৌলিক ধারণা এবং ন্যায়বিচারের স্থান;
৩. ইসলামের অপরাধ বিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি;
৪. ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন;
৫. শরী'আহ, ইসলামী আইন এবং সমসাময়িক সংঘাত-উত্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা।

প্রথম অধ্যায়টি মোট দশটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি ভূমিকা ও শেষেরটি উপসংহার; বাকিগুলো হচ্ছে,

০১. ফিক্‌হ ও আইনের মূলনীতিবিজ্ঞানের[৬]ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কাল পরিক্রমা (Historical periods)

এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে,

১.১. ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হে অনারব ও অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং

১.২ ইসলামের আরব বৈশিষ্ট্য,

০২. শরী'আহর অর্থ এবং এর উপযোগিতা[৭],

০৩. ইসলামী আইন বা ফিক্‌হের অর্থ এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্র ও সুযোগ,

০৪. আইনের মূলনীতিবিজ্ঞান বা উসূলে ফিক্‌হ (এখানেও দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ১. মাযহাব[৮] এবং ২. ইসলামী আইনের উৎস এবং এর স্তরবিন্যাস[৯],

---

৫. আরবীতে যথাক্রমে فقه এবং علم اصول الفقه

৬. অতঃপর আমরা একে বোঝার সুবিধার্থে 'উসূলে ফিক্‌হ' বলব।

৭. Scope

৮. পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্, আলেমদের ঐকমত্য এবং কিয়াস (Analogy) এ চারটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ আইন বিশেষজ্ঞ তথা ইমামদের ইসলামী আইনের সবিস্তার ও বিশদ ব্যাখ্যা এবং এ বিষয়ে তাঁদের স্ব স্ব চিন্তাধারাকে পৃথক পৃথক মাযহাব (School of Thought) বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেকগুলো মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। তবে আলেম সমাজের সমর্থন, তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এর মধ্যে চারটি এখনও মুসলিমদের মাঝে চালু রয়েছে। বাকিগুলো কালের পরিক্রমায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।- গ্রন্থ পর্যালোচক

৯. Ranking

০৫. শরী'আহ্ এবং ইসলামী আইনের প্রাথমিক ও প্রধান উৎসসমূহ (এখানে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ-এর লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণনার উৎস তথা সনদ এবং সনদের স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর)

০৬. ব্যুৎপত্তিগত এবং অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি

০৭. ইসলামী চিন্তার পুনরুত্থান

০৮. সংঘাত ও শান্তিতে শরী'আহ এবং ইসলামের সাধারণ আইনের ব্যবহার উপযোগিতা এবং

০৯. সমসাময়িক আইনি বিষয়ের বিবর্তনমূলক ঘটনাপ্রবাহ।

'ইসলামে মানবাধিকারের মৌলিক ধারণা এবং ন্যায়বিচারের স্থান' দ্বিতীয় অধ্যায়টি মোট ছয়টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি ভূমিকা ও শেষেরটি উপসংহার; বাকিগুলো হচ্ছে,

১. মানুষের জীবন ও সম্মানের সুরক্ষা
২. ন্যায়বিচার
৩. শরী'আহ্য় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অবস্থান
৪. মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার সর্বজনীনতা এবং শান্তি ও সংঘাতে মানবাধিকার ও মানুষের মানবিক মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব।

ইসলামে অপরাধ বিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখক তাঁর বক্তব্য সাতটি ভাগে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের মত এখানেও একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার ছাড়াও এ অধ্যায়টি পাঁচটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন :

১. দণ্ডবিধি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ
২. শরী'আহ প্রদত্ত দণ্ডবিধির বৈশিষ্ট্য; এর অধীনে চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

২.১. আইনি ভিত্তি বা আইনি বৈধতার নীতি (যে কোন দণ্ডই নন্-রিট্রোএক্টিভ[১০], এমন কোন অপরাধ থাকবে না যে সম্পর্কে আইনি বিধান নেই; অন্যদিকে আইনি ভিত্তি ছাড়া কোন অপরাধেরই শাস্তি হবে না)

২.২. নির্দোষিতার পূর্বানুমান (প্রথমে ধরে নিতে হবে যার সম্পর্কে অভিযোগ সে নিরপরাধ)

[১০]. আইন করা হচ্ছে এখন কিন্তু তা কার্যকর হিসেবে ধরা হবে পূর্বের নির্দিষ্ট একটি সময় থেকে, যেন এ আইন বা দণ্ডবিধি প্রণয়নের পূর্বে কৃত কোন আচরণ তথা অপরাধের জন্য এ আইন বা বিধির অধীনে দণ্ড দেয়া যায়- ইসলামের দণ্ডবিধি এমন পেছন থেকে কার্যকর নয়।

২.৩. আইনের চোখে সকলেই সমান

২.৪. ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের দায়[১১]

৩. শরী'আহ্য় অপরাধ ও দণ্ড (শরী'আহয় নির্ধারিত প্রধান তিন ধরনের শাস্তি) সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

৩.১. হদ্দ, (حد)

৩.২. কিসাস (قصاص) ও

৩.৩. তা'যীর (تعزير)

৪. শরী'আহ্ ও ইসলামী আইনে প্রকৃত অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া বিষয়ক[১২] প্রশ্ন এবং সাক্ষ্য ও প্রমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

৫. ইসলামের অপরাধ আইনে বিচার (ক্রিমিনাল জাস্টিস[১৩]) এবং সংঘাত-উত্তর বা অন্তবর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা (ট্রোনজিশনাল জাস্টিস[১৪])

চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ 'ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক আচরণ ও মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন' অংশে একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার ছাড়াও মোট আটটি উপ-অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. ইসলামী আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন
২. ইসলামী আইন এবং মানবিক আচরণ ও মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন
৩. আগ্রাসন, সমানুপাতে পাল্টা আগ্রাসন[১৫] এবং প্রতিশোধ গ্রহণে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা (এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:)

৩.১. অনাগ্রাসন বা নন্ আগ্রাসন

৩.২. সমানুপাতে পাল্টা আগ্রাসনে নিষেধাজ্ঞা

৩.৩. প্রতিশোধ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

[১১]. Individual and other forms of criminal responsibility

[১২]. প্রসিডিউরাল (Procedural)

[১৩]. Criminal justice বা 'অপরাধ আইনে বিচার' সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, অপরাধমূলক কাজ নিরুৎসাহিত করা ও কমানো এবং আইন লঙ্ঘনকারী অপরাধীকে শাস্তিপ্রদান ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদির জন্য নির্দেশিত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের কিছু কাজের পদ্ধতিকে বলা হয়। এ ব্যবস্থায় অভিযুক্তের তদন্তকালীন এবং প্রসিকিউশনের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে সুরক্ষার সুযোগ রয়েছে। উৎস:
https://en.wikipedia.org/wiki/ Criminal_justice

[১৪]. Transitional justice

[১৫]. প্রপরশনালিটি (Proportionality)

৪. নিষেধাজ্ঞা এবং নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সুরক্ষা (এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:)

৪.১. মুসলিমের হাতে মুসলিম হত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৪.২. শিশু হত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৪.৩. আত্মহত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৪.৪. ধর্মীয় স্থানসমূহের সুরক্ষা

৪.৫. পবিত্র কালসমূহের (Period) পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখা

৪.৬. কূটনীতিক ও রাষ্ট্রীয় দূত হত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৫. তালিবানদের লয়া[১৬]

৬. জিহাদ ও শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে শরী'আহ্‌র নিয়ন্ত্রণ[১৭] (এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে -)

৬.১. জিহাদের পরিচয়

৬.২. জিহাদের প্রকৃতি

৬.৩. 'জিহাদ' কথাটির বিবর্তনশীল অর্থ

৬.৪. বিদ্রোহ

৬.৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সন্ত্রাস ও সহিংস আচরণ এবং জিহাদ

৭. সমসাময়িক মুসলিম সংঘাত ও সশস্ত্র যোদ্ধা (কমব্যাটেন্ট[১৮]) সম্পর্কে বিবরণ

৮. সমঝোতা ও পুনঃমৈত্রী প্রতিষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ 'শরী'আহ, ইসলামী আইন এবং সমসাময়িক সংঘাত-উত্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা' অংশে একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার ছাড়াও দুটি উপ-অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. সমসাময়িক মুসলিম দেশসমূহে সংঘাত-উত্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থার প্রয়োগ

২. শিকাগো নীতিমালা; এখানে দুটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে -

২.১. সংঘাত-উত্তর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক উপাদান এবং নীতিমালা

[১৬] (Layha) লয়া অর্থ পার্লামেন্ট বা আইনসভা; এখানে আফগান তালিবানদের নিজস্ব আইনসভা এবং আইনসভায় অনুমোদিত বিধি, যা সরকারের অনুমোদিত নয়।

[১৭] লিমিটেশন (Limitation)

[১৮] যাদেরকে সাধারণভাবে 'জঙ্গী' বলে শ্লেষাত্মক ভাষায় অভিহিত করা হয়।

২.২. সংঘাত-উত্তর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন।

এ ছাড়া গ্রন্থটিতে পাঁচটি পরিশিষ্ট রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

পরিশিষ্ট ক: ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জির সময়কালের ধারাবাহিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পরিশিষ্ট খ: মুসলিম দেশে সশস্ত্র সংঘাত এবং এর প্রকৃতি

পরিশিষ্ট গ: ইসলামী আন্তর্জাতিক বিচার আদালত গঠন সম্পর্কিত আইন

পরিশিষ্ট ঘ: ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষণা এবং

পরিশিষ্ট ঙ: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস মোকাবিলা বিষয়ক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কনভেনশন।

এ ছাড়াও গ্রন্থটিতে একটি নির্ঘণ্ট ও একটি গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে, যেখানে এ গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত সকল তথ্যসূত্র উল্লিখিত রয়েছে। তবে মূল গ্রন্থটি শুরুর পূর্বে এতে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের একটি তালিকা এবং একটি এবরিভিয়েশন তালিকা সংযুক্ত রয়েছে। পরিভাষাসমূহের তালিকায় আলোচ্য গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে।

গ্রন্থটির মূল ভূমিকায় লেখক প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা অসঙ্গত হবে না; যেহেতু পাঠক এতে একদিকে বইটিতে কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন, তেমনি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য (Motive) সম্পর্কেও পাঠক সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে লেখকের ভূমিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু আলোচনা করেই গ্রন্থ পর্যালোচনা শেষ করা হল।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, পশ্চিমা অনেকের কাছেই ইসলামের প্রকৃত পরিচয় অজানা। কেননা ইসলাম তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন উপাদান নয়। এ অজ্ঞতার পাশপাশি যখন কিছু কিছু মুসলিমের ইসলাম পরিপন্থী আচরণ তাদের সামনে প্রকাশ পায়- যার কথা উপরে বলা হয়েছে- পশ্চিমা লোকেরা তার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তাতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল বোঝার মাত্রা আরো বেড়ে যায়।[১৯] লেখক এ ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বের কথা তুলে

[১৯] লেখক উদাহরণ হিসেবে আরো বলেছেন, অজ্ঞতা ও ইসলাম ফোবিয়ার কারণে কোন কোন সমাজে এক ধরনের অনিশ্চিত ও অযৌক্তিক উৎকণ্ঠা দেখা যায়। তারা ভাবে, মুসলিম শক্তি ক্ষমতায় গেলে অভ্যন্তরীণ (Domestic) এবং সকলের জন্য সাধারণ আইনের ক্ষেত্রেও শরী'আহ আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরুন। এখানে কিছু কিছু সমালোচক বলেন, এ দেশের ৬ মিলিয়ন মুসলিম নাগরিক ফেডারেল এবং স্টেট আইনে শরী'আহ আইন গ্রহণ করার জন্য প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে। সাম্প্রতিক

ধরেছেন যেখানে মুসলিম ও পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীর মাঝে ঐতিহ্যগতভাবেই পার্থক্য রয়েছে। লেখক বলেছেন, পশ্চিমারা এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় ভুলে যায়; সেটা হচ্ছে পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী এবং মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জীবনে কালের পরিক্রমায় যে মানবিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে তা একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতার বিষয়টি তারা ভুলে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার, মুসলিম জাতিগোষ্ঠী প্রায় এক শতাব্দী আগে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পর থেকে তুলনামূলক নিকট অতীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। সে বেড়াজাল থেকে যদিও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ক্রমান্বয়ে মুক্তি পেয়েছে বটে; কিন্তু এখনও তাদের পশ্চিমাদের নতুন সাম্রাজ্যবাদী নীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। দুঃখজনক হচ্ছে এই নব্য সাম্রাজ্যবাদের কুপ্রভাবেই অধিকাংশ মুসলিম দেশে সেই অটোম্যান-উত্তর সময় থেকেই অগণতান্ত্রিক চরিত্রের সরকারগুলো জেঁকে বসেছে।[২০]

লেখকের মতে, পাশ্চাত্যের অনেকে মুসলিমদের ব্যাপারে যা ধারণা করে বাস্তবে কিছু কিছু মুসলিমের নিজেদেরই ভুল ও সহিংস আচরণ এবং ভুল ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত অমুসলিমের হাতে যত মুসলিম নিহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মুসলিম তাদের স্বধর্মীয়দের হাতে নিহত হয়েছে। তিনি এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, ২০০২ সনে আমেরিকার হামলার মধ্য দিয়ে সাদ্দাম হুসেনের পতনের পর ২০০৩ সন থেকে ইরাকে জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে গণহত্যা এবং সাদ্দামের শাসনামলে ইরাকে এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ঐ দু'দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের কথা বলা যায়।[২১] সাম্প্রতিক সিরিয়ায় যা ঘটছে তা শরী'আহ্ ও ইসলামী আইন

বছরগুলোতে অনেকগুলো স্টেটের আইনসভা (State Legislature) সদস্যগণের অনেকে আদালত যেন আন্তর্জাতিক, যেমন, ইসলামী বা শরী'আহ আইনের প্রয়োগ ঘটাতে না পারে সে জন্য আইনি ব্যবস্থা বা শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আনার জন্য লবিং করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সনে ওক্লাহোমা স্টেটে এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। তবে ২০১২ সনে একটি ফেডারেল আপিল আদালত তা বাতিল করে দিয়েছে এ বলে যে, ওক্লাহোমা স্টেট আইনসভা কখনো কোন বিদেশী আইনের কোন কিছু গ্রহণ করেছে এমন কোন নজির নেই; এ ধরনের উদ্যোগের ফলে সেখানে সত্যিকার কোন সমস্যা হওয়া দূরের কথা। অতএব এ ধরনের সংশোধনীর প্রয়োজন নেই।

২০. দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। এখনও এ সব দেশের কোন কোনটিতে গণতন্ত্রের নামে চলছে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বৈরশাসন। - গ্রন্থ পর্যালোচক

২১. তবে এ সব হত্যাকাণ্ড বা গণহত্যা ধর্মীয় ভুল বিশ্বাসের কারণে হয়েছে তা বলা যায় কি না- এ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। কেননা এ সব হত্যাকাণ্ড সবই হয়েছে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক কারণ এবং সামরিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। - গ্রন্থ পর্যালোচক

লঙ্ঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ।[২২] লেখক বলতে চেয়েছেন, মুসলিম কি অমুসলিম যে কোন নিরীহ বেসামরিক মানুষের প্রতি সহিংস আচরণ ইসলাম পরিপন্থী। সিরিয়ার চলমান ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন এবং মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন ছাড়া কিছু নয়।

তবে এ সব সহিংসতার প্রেক্ষিতে অনেক দেশে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লেখক বলছেন, সমসাময়িক সহিংসতা-উত্তর অন্তবর্তীকালীন বিচারিক উদ্যোগ এক ধরনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে; পাশাপাশি এটা বিচারহীনতাকে নিরুৎসাহিত করেছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো দায়ী ব্যক্তিদের- যাদের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে গুরুতর বেআইনী আচরণ করার অভিযোগ রয়েছে- তাদেরকে আইনের আওতায় এনেছে। এ উদ্যোগ শরী'আহ্ এবং ইসলামী আইনের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ, নিরস্ত্র মানুষ হত্যা এবং বিশেষ করে নারী ও শিশু এবং অসুস্থ ও আহত মানুষসহ বেসামরিক লোককে হত্যা, ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস এবং মানুষকে দৈহিক নির্যাতন বা টর্চার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ধরনের আচরণের পক্ষে ইসলামে কোন ওজর বা যৌক্তিকতা[২৩] নেই। এগুলো শরী'আহ্ ও ইসলামী আইনে অপরাধ (Criminal Act) বলে গণ্য।[২৪] কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা অপর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ইসলামী পণ্ডিত বা রাজনৈতিক কর্মীর মতবাদ হিসেবে এ ধরনের কাজের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা এ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবে না বা একে বদলাতেও পারবে না। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হতে পারে এবং কখনো কখনো দেখানো হয়ও বটে যে, এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্য (Ends) ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমকে (Means) যথার্থ প্রমাণ করে। কেননা এ ধরনের কাজ ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে এবং ধর্মীয় কারণে করা হচ্ছে; ঐ কারণ এ ধরনের উদ্দেশ্য (Ends) হাসিলের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এ ধরনের মাধ্যম (Means) ঐ উদ্দেশ্য এবং পাশাপাশি এর উচ্চমূল্যবোধ ও আদর্শিক নীতি অর্জনের পথে নিয়ে যায়। অতএব চূড়ান্ত বিচারে এ ধরনের কাজ যৌক্তিক এবং যথার্থ।[২৫]

২২. নিঃসন্দেহে সিরিয়ায় সরকারী ও বিদ্রোহী বাহিনীর মাঝে যা ঘটছে তা ইসলাম পরিপন্থী, তবে তা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত কোন কারণে ঘটছে না; ঘটছে রাজনৈতিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে। - গ্রন্থ পর্যালোচক

২৩. Excuse and justification

২৪. এ বিষয়ে লেখক এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।

২৫. এ মতবাদ বা ধারণার উৎস হচ্ছে নিকোলো ম্যকিয়াভ্যালি, দ্রষ্টব্য IL PRINCIPE: LE GRANDI OPERE POLITICHE (G. M. Anselmi I E. Menetti trans., ১৯৯২)

উপরিউক্ত সহিংস আচরণের পক্ষে এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করা হলেও ইসলাম এ ধারণা ও যুক্তি গ্রহণ করে না। পবিত্র কুরআনের যে কোন নির্দেশনা এ সিদ্ধান্তই দেয়; যদিও এ ব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের ফাতওয়া ভিন্ন রকম। এ সব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশেরই এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ফাতওয়া (নির্দেশনা) দেয়ার যোগ্যতা নেই। লেখক তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পূর্বশর্ত ও যোগ্যতা থাকা জরুরি। উসামা বিন লাদেনের এ ধরনের যোগ্যতা ছিল না। শুধু তাই নয়, বিন লাদেনের মত মুসলিম বিশ্বে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের রাজনৈতিক/ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন যাঁদের এ ধরনের যোগ্যতা নেই। লেখক বলছেন, এ ধরনের ফাতওয়ার অপব্যবহার সারা মুসলিম বিশ্বেই রয়েছে। স্পষ্টত ধারণা করা যায়, লেখক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলতে উসামা বিন লাদেনের মত ব্যক্তিকেই বুঝিয়েছেন।

লেখক নিরপরাধ মুসলিম-অমুসলিমের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে আরো বলেছেন, মুসলিম-অমুসলিম বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ ইসলাম বিরুদ্ধ; সেটা যেভাবেই হোক- কোন গ্রুপ, যেমন, সোমালিয়ার আশ্-শাবাব গ্রুপ[২৬], নাইজেরিয়ার বোকো হারাম[২৭], মালির আনসারে দ্বীন[২৮] এবং আফগানিস্তানের

২৬. হারাকাত আশ্-শাবাব আল-মুজাহিদীন বা Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM; আরবীতে حركة الشباب المجاهدين, সোমালি ভাষায় *Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab*; 'মুজাহিদীন যুব আন্দোলন'), 'আল-শাবাব' নামেই অধিক পরিচিত (Al-Shabaab (আরবীতে الشباب; যুবক), সোমালিয়াভিত্তিক একটি উগ্রপন্থী জিহাদী বা সন্ত্রাসী গ্রুপ। খ্রিস্টীয় ২০১২ সনে এ গ্রুপটি কথিত আল-কায়েদার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। ২০১৪ সন নাগাদ আল-শাবাবের ৭০০০ থেকে ৯০০০ সশস্ত্র সদস্য ছিল বলে অনুমান করা হয়। চলতি বছর ২০১৫ সন নাগাদ গ্রুপটি সোমালিয়ার অধিকাংশ শহর থেকে পিছু হটে কেবল কিছু পল্লী এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। এ গ্রুপটি সে দেশে সমমনাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক কোর্ট্স্ ইউনিয়ন (Islamic Courts Union, ICU) এর একটি সশস্ত্র শাখা। তবে ২০০৬ সনে সোমালিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন ফেডারেল সরকার এবং তার ইথিওপিয়ান সহযোগী বাহিনীর হাতে আল-শাবাব পরাজিত হওয়ার পর এটি অনেকগুলো উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল-শাবাব নিজেদেরকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাকারী বলে দাবি করে। এ গ্রুপটি সোমালিয়ার ফেডারেল সরকার এবং সোমালিয়া কেন্দ্রিক আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন (African Union Mission to Somalia, AMISOM)এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র আল-শাবাব'কে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ গ্রুপটির বহু জ্যেষ্ঠ্য নেতার মাথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group)

২৭. বোকো হারাম (Boko Haram), অফিসিয়াল নাম 'আল ভিলায়াতুল ইসলামিয়া গারব আফরীকিয়্যা' (الولاية الاسلامية غرب افريقيا) অর্থাৎ ইসলামিক স্টেটের পশ্চিম আফ্রিকা

তালিবানদের দ্বারা সংঘটিত সহিংস আচরণ কিংবা ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মঘাতী বোমা হামলা- কোনটিই ইসলাম সম্মত নয়।

এ বিষয়ে লেখক আরো বলেছেন, গত কয়েক দশক ধরে এমন বহু যোগ্যতাবিহীন (Unqualified) ফাত্ওয়াদাতা দেখা গেছে যাঁরা, তাঁদের স্বার্থলাভের জন্য শরী'আহ্ এবং ইসলামী আইন বিকৃত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আফগানিস্তানে তালিবানদের জারি করা 'লয়া' (Layha) অর্থাৎ বিধি-বিধানের উল্লেখ করেছেন। তালিবান এমনভাবে তাদের বিধি-বিধান জারি করেছে যেন সেটা হানাফী মাযহাব যেভাবে শরী'আহ্ ও ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করেছে সে ব্যাখ্যাকেই ধারণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে ইসলামে যুদ্ধ আইনকে সূত্রবদ্ধ আইনে রূপান্তরকারী প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত প্রখ্যাত হানাফী পণ্ডিত ইমাম শায়বানীর মতে, শরী'আহ্ ও ইসলামে যুদ্ধ

প্রদেশ (ISWAP), প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'জামা'আতু আহলিস্ সুন্নাহ লিদ্-দাওয়া ওয়াল-জিহাদ' (جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد), বাংলায় 'ধর্মপ্রচার ও জিহাদের জন্য সুন্নাহভিত্তিক লোকদের দল', উত্তর নাইজেরিয়াভিত্তিক একটি চরমপন্থী ইসলামী দল। এ গ্রুপটি শাদ, নাইজার ও ক্যামেরুনেও সক্রিয়। বর্তমানে এর সক্রিয় সশস্ত্র সদস্যের সংখ্যা আনুমানিক সাত থেকে দশ হাজার। বোকো হারাম ২০১৪ সালে ইরাকের ইসলামিক স্টেটের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করে। খ্রিস্টীয় ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বোকো হারামের ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থা ২০০৯ সালে নাইজেরিয়ায় সহিংস গণঅভ্যুত্থান ঘটায়; ফলে এর নেতাদের সংক্ষিপ্ত বিচার করে হত্যা করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে কারাগার ভেঙ্গে গণহারে বন্দী পলায়নের ঘটনার পর বোকো হারামের পুনরুত্থান হয়। এ সময় থেকে তারা কৌশলী আক্রমণ শুরু করে- প্রথম দিকে দুর্বল লক্ষ্যবস্তুতে, যা পরবর্তীতে পুলিশ ও জাতিসংঘ অফিসে আত্মঘাতী বোমা হামলায় পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় ২০১২ সালে সে দেশের সরকারের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর যুগপৎ নিরাপত্তা বাহিনী এবং বোকো হারামের সশস্ত্র আক্রমণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে যায়। বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বোকো হারামের আক্রমণে আনুমানিক তের হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে দশ হাজারই নিহত হয়েছে ২০১৪ সালে।

উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

২৮. আনসারে দীন (Ansar Dine), আররীতে انصار الدين অর্থাৎ দীন বা ইসলামের সাহায্যকারী, মালির একটি ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী। এর নেতা ইয়াদ আল-ঘালি, যিনি ১৯৯০ এর দশকের একজন বিশিষ্ট তুর্যাগ বিদ্রোহী নেতা। আল-কায়েদা ইন দি ইসলামিক মাগরিব (ইসলামী মরক্কো) এর সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়। আনসারে দীন সমগ্র মালিতে শরী'আহ্ আইন চালু করতে চায় বলে ঘোষণা করে। মার্চ ২০১২ সালে এ গ্রুপটির প্রথম সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ এর দশকে শরীফ উসমান হায়দার-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ মালিতে আনসারে দীন নামে একটি সুফি মতবাদকেন্দ্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ওই আন্দোলন আর বর্তমান আনসারে দীন এক নয়; পূর্বেরটি জঙ্গি আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_Dine

আইনের যে মানদণ্ড রয়েছে সে মানদণ্ডের বিচারে তালিবানদের লয়া (Layha) ইসলামী যুদ্ধ আইনের সাথে কেবল আংশিকভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পেরেছে। লেখক জানাচ্ছেন, তালিবানদের লয়া আত্মঘাতী বোমা হামলাকে যথার্থ বলে মনে করে। অথচ আত্মঘাতী হামলা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা ইসলামে আত্মহত্যা করা অথবা আত্মহত্যার মাধ্যমে বহু মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা একটি অপরাধ।...

লেখকের মতে, গত শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্ব বেশ কিছু মৌলিক সমস্যায় জড়িয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত এগুলোর সমাধান করা যায়নি। লেখক মনে করেন, এগুলোর একটি হচ্ছে ইসলামে আধুনিকতার প্রয়োজনগুলোর এবং আধুনিকতায় ইসলামের দাবিগুলোর খাপ খাওয়ানোর সমস্যা। তিনি মন্তব্য করেন, ইসলাম ও আধুনিকতা বিষয়দুটোকে পাশাপাশি উপস্থাপনই বহু মুসলিমের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তিনি বলেন, মুসলিম সংস্কারকগণ, বিশেষত যাঁরা পরিবর্তন অর্থাৎ আধুনিকতার প্রয়োজন ইঙ্গিত করতে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন, তাদেরকে সাধারণ মুসলিম এবং সাধারণ মুসলিম পণ্ডিতগণ অনেক সময় তুচ্ছার্থে পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক বলেন। মুসলিম সেক্যুলারিস্টদেরকে বোঝাতেও এ শব্দটি তারা ব্যবহার করেন।[২৯] যদিও পবিত্র কুরআনে 'ইল্‌ম্ (علم) বা 'জ্ঞান' শব্দটি অথবা এ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন শব্দ মোট আট শ আশিবার এসেছে এবং তা সর্বত্র ইতিবাচক অর্থেই এসেছে।

মুসলিম বিশ্বে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলীর সাথে এক ধরনের ধর্মীয় ও আইনগত তাত্ত্বিক সম্পর্ক দেখানোর পেছনে আর্থ-সামাজিক নানা কারণ ছাড়াও প্রধান দুটি কারণ রয়েছে বলে লেখক মনে করেন। তিনি বলেন, একটি কারণ হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান প্রাথমিক পর্যায়ের; কিছু কিছু সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জ্ঞান একেবারে নগণ্য (Primitive)। তিনি এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এর কারণ হচ্ছে মানব উন্নয়নে[৩০] এ সব সমাজ পিছিয়ে আছে। তিনি বলছেন, এ কারণে

২৯. পরিবর্তনের পক্ষে কথা বললে মুসলিম পণ্ডিত বা আলেমসমাজের সকলেই সেটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন না; যতক্ষণ না তাতে শরী'আহ বা ইসলামী আইনে ইসলাম অসমর্থিত উপায়ে কোন পরিবর্তন অথবা এর কোন অংশকে বর্জন কিংবা কোন অংশের কুরআন-হাদীস অসমর্থিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়। যাঁরা নিজেদের সেক্যুলারিস্ট বলে পরিচয় দেন কিংবা ইসলামে পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলেন এবং ইসলাম ধর্মের বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, প্রায়শ দেখা যায় ইসলাম ধর্ম, শরী'আহ্ বা ইসলামী আইন সম্পর্কে তাঁদের সম্যক জ্ঞান নেই। শরী'আহ্, ইসলামী আইন এবং সাধারণভাবে ইসলাম ধর্ম একটি ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিষয়; এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক গভীর অধ্যয়ন ছাড়া আংশিক বা ভাসাভাসা জ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্তিতে জড়ানোর আশঙ্কা থেকেই যায়। -গ্রন্থ পর্যালোচক

৩০. আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ধরনের মানব কল্যাণের ধারণা থেকে মানব উন্নয়ন (Human development) কথাটি এসেছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme) মানব উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে: "the process of enlarging people's choices", said choices being allowing them to "lead a long and healthy life, to be educated, to enjoy a decent standard of living", as well as "political freedom, other guaranteed human rights and various ingredients of self-respect." Drm: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_development_(humanity)

কোন কোন মুসলিম দেশে কিছু কিছু কথিত ইসলামী পণ্ডিত, ইমাম বা শায়খ রয়েছেন যাঁরা যতটা না মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক কর্মী (Actor)। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিতে ইসলাম ও শরী'আহ্‌র বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মত করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে নিতে আপত্তি করছে না। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, বর্তমানে এগুলো ঘটছে সোমালিয়া, মালি, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং মিসরে। তাঁর মতে, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠী, বিশেষত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী ওয়াজিরিস্তানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা দেখা যায়। তাঁর ভাষায় রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইসলামের ব্যাখ্যার সাম্প্রতিক বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ২০১২ সনের সেপ্টেম্বরে রাসূলুল্লাহ স.-কে অবমাননামূলক ভিডিও ইন্টারনেটে আপলোডের বিরুদ্ধে প্রায় বিশটি মুসলিম দেশে আমেরিকা বিরোধী সহিংস প্রতিবাদের ঘটনা, যখন লিবিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে হামলা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হয়।[৩১] তিনি এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানে মালালা ইউসুফজাই এর উপর পাকিস্তানী তালিবানদের হামলার ঘটনাটিও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, রাষ্ট্রদূত হত্যা করা বা তাকে আহত করা বা বিদেশী সম্পদ ধ্বংস করা শরী'আহ্ ও ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ। মালালাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করার ঘটনাটিরও ইসলামে কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই; বরং তা একটি অপরাধ।... এগুলো, লেখকের ভাষায়, ইসলামের নামে সংঘটিত সহিংসতা; কিন্তু এগুলো ইসলামে অনুমোদিত নয়।... তিনি আরো বলছেন, এ ধরনের ঘটনার পেছনে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, হতাশা, ক্রোধ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ সক্রিয় রয়েছে। এ ধরনের ঘটনার অনেকগুলোর পেছনে কিছু কিছু ইসলামী পণ্ডিতের বা ইসলামী পণ্ডিত বলে দাবি করেন এমন ব্যক্তিবর্গের অপর্যাপ্ত জ্ঞানও দায়ী, যাঁদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মদীনার জীবনে এবং পরবর্তী দু'শ বছরে মুসলিম উম্মাহ ইসলামকে বোঝার যে মানদণ্ড তৈরি ও ব্যবহার করে গেছেন সে মানের চেয়ে নিচের।

৩১. রাষ্ট্রদূত হত্যা ইসলামসম্মত নয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ স.-কে অবমাননার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করা অন্যায় নয়। সব ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা (যে ধর্মের অনুসারী যে আচরণকে অসম্মানজনক মনে করে সে আচরণ পরিহার করাও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে) জাতিতে জাতিতে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সহমর্মিতা ও মৈত্রী- অন্তত অহিংসা প্রতিষ্ঠা এবং তা ধরে রাখার জন্য পূর্বশর্ত- এ কথা কেবল মুসলিমদের মনে রাখতে হবে তা নয়, সব ধর্মের মানুষকেই তা গ্রহণ করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। তবেই তা অর্থবহ হবে।- গ্রন্থ পর্যালোচক

মুসলিম বিশ্বে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলীর এক ধরনের ধর্মীয় ও আইনগত তাত্ত্বিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টার পেছনে আরেকটি কারণ রয়েছে, যা ধর্মতাত্ত্বিক ও ইসলামী আইনি মতবাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সাথে সম্পর্কিত। কারণটি হচ্ছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের স্বর্ণযুগে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল, মোঙ্গল ও সেলজুকদের হামলার মাধ্যমে কার্যত তার সমাপ্তি ঘটে। সে সময় আব্বাসী যুগের সভ্যতার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, মোঙ্গল ও সেলজুকদের হামলায় তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। দশম শতকের শুরু থেকে সুন্নী আলেম সমাজ সমসাময়িক অন্যান্য জাতি ও সভ্যতা থেকে আগত নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার পদ্ধতি (যেমন, যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র, যা গ্রীক সভ্যতা থেকে এসেছিল) ইত্যাদির ব্যাপক আকারে মুসলিম সমাজে প্রবেশের কারণে চিন্তিত হন। একদিকে দক্ষিণ ইউরোপ, পারস্য ও ভারতবর্ষে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিস্তার এবং বিপরীত দিকে গ্রীস ও বায়জান্টাইন থেকে ঐ সব জাতির ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ধরণ এবং রীতি ও পদ্ধতির মুসলিম সমাজের সাথে মিশ্রণের কারণে তাদের মধ্যে এগুলো প্রবেশের এ অন্তঃপ্রবাহ (Influx) ছিল স্বাভাবিক। এর ফলে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অমুসলিমদের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রভাব পড়ে। এটি বিশেষত আরব থেকে আগত তুলনামূলক অধিক রক্ষণশীল মনোভাবের ধর্মতত্ত্ববিদ বা ইসলামী পণ্ডিতসমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলে। তারা মনে করেন, এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক খোলাদ্বার বা উদার (Openness) নীতি মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনে বিভক্ত করার অন্যতম কারণ। শিয়া-সুন্নী বিভক্তি এবং খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা আন্দোলন প্রভৃতি ছিল রক্ষণশীল ধর্মীয় পণ্ডিতসমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক খোলাদ্বার নীতির লাগাম টেনে ধরার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ। এ প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যায় অনমনীয় ভাষাগত বা মূলানুগ (Literalism) বিশ্লেষণকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এতে যুক্তির (Reason or logic) ব্যবহার বন্ধ করা হয়।[৩২] বস্তুত লেখক এভাবে

৩২. কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় কেবল শব্দগত অর্থ নয়; তার ব্যবহারিক এবং পরিভাষাগত অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যাকে সামনে রাখা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যার লজিকের ব্যবহার পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষত যখন এর অতি ব্যবহার মুসলিম সমাজে একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। আল্লাহ এক ও অনাদি, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁর মত অনাদি ইত্যাদি ইসলামের আকীদাগত নানা বিষয় নিয়ে তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে সত্যাসত্য প্রমাণ করা এবং এ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মত নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতগণ যুক্তির ব্যবহার পরিহারের পথ অবলম্বন করেন। -গ্রন্থ পর্যালোচক

ইজতিহাদ[৩৩] বন্ধ করা ও পরবর্তীতে কারো কারো তাতে আপত্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে বিতর্কের তিনি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যা হোক, দৃশ্যত তিনি এভাবে যুক্তির ব্যবহার তথা স্বাধীন ইজতিহাদ কার্যত বন্ধ করে দেয়াকে মুসলিম জগতে সাম্প্রতিক সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনকে এক ধরনের ধর্মীয় ও আইনগত তাত্ত্বিক ভিত্তি দেয়ার প্রচেষ্টার অন্যতম কারণ বলে ইঙ্গিত করেছেন।

পরিশেষে লেখক এ গ্রন্থটি লেখার পেছনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পাঁচটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে: এ বিষয়টি পাঠকের সামনে তুলে ধরা যে, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (IHL) এবং মানবিক আচরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন (IHRL), যা সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং পাশাপাশি সমসাময়িক সংঘাত-উত্তর ও অন্তবর্তীকালীন বিচারব্যবস্থার নিয়ম ও কৌশল (Mechanism) শরী'আহ ও ইসলামী আইন বা ফিক্‌হের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; পাশাপাশি এ তিনটি বিষয়কে ব্যবহার করা সম্ভব। দ্বিতীয় হচ্ছে, শরী'আহ এবং ইসলামী আইনের মুহাররাম (নিষিদ্ধ), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) বিষয় এবং ইসলামী আইনের যে অংশ মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে কিংবা মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে সহিংস আচরণ সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং পাশাপাশি শরী'আহ ও ইসলামী আইনের অধীনে মুসলিমদের আইনগত দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোন ধরনের সংঘাতের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক আচরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের পর্যবেক্ষণ-সীমা বাড়ানো, সংঘাত-উত্তর এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থার নিয়ম ও কৌশলসহ- যার উদ্দেশ্য হবে রিস্টোরেটিভ বিচারব্যবস্থা[৩৪] নিশ্চিত করা এবং অপরাধীকে বা সংঘাত সৃষ্টিকারীকে নিরুৎসাহিত করা, যেন এর মাধ্যমে মানবিক

৩৩. اجتهاد **Ijtihad** ("diligence") ইসলামী আইন সম্পর্কিত একটি পরিভাষা। ইজতিহাদ হচ্ছে কুরআন-হাদীস-ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে কোন আইনি সমস্যার সমাধান স্বতন্ত্রভাবে খুঁজে বের করা। এটি তাকলীদের বিপরীত। এর জন্য প্রয়োজন কুরআন-হাদীস এবং এ দুটোর ভিত্তিতে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইজমা, এবং কিয়াসের পদ্ধতি ও আরবী ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। এ সব যোগ্যতার অধিকারী একজন মুজতাহিদকে সতর্কতার সাথে আইনি যুক্তি-কিয়াস-ভাষাগত ব্যাখ্যা ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন আইনি সমস্যার সমাধান বের করতে হয়।

৩৪. রিস্টোরেটিভ জাস্টিস (Restorative justice) অপরাধ আইনের এমন একটি পদ্ধতি, যা অপরাধের শিকার এবং বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তার সমাজের সাথে অপরাধীর সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে অপরাধীকে পুনর্বাসিত করতে চায়। উৎস: https:// www.google.com.bd/ ?gws rd=cr,ssl&ei=JtTSVfjqBMeNuAS1uIHIDQ#q=what+is+Restorative+justice+

বিপর্যয় এবং সম্পদের ক্ষতি কমানো যায়। চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে, অমুসলিমদেরকে শরী'আহ্ ও ইসলামী আইন সম্পর্কে অবহিত করা। কেননা, লেখকের মতে, ভবিষ্যতের মুসলিম সমাজের স্বরূপ গঠনে অমুসলিম সমাজ ক্রমশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠছে। পঞ্চম উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামফোবিয়ার কোন ভিত্তি নেই তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করা, যারা কিছু মুসলিমের ধর্মীয় ও বর্ণবাদী ঘৃণা সৃষ্টির প্রোপাগাণ্ডাকে জনসমর্থিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ঘৃণ্য তৎপরতাকে ছুঁতো বানিয়ে ইসলাম ধর্মের অসম্মান করতে চায় এবং ইসলামকে খাটো করতে চায়। এভাবে ইসলামফোবিয়ার অসারতা প্রমাণ করে পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে সৃষ্ট টানাপোড়েন হ্রাস করাই গ্রন্থটি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায়, লেখক এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে গিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। তিনি অনলাইন ও অফলাইন উভয় উৎস থেকে অগণিত গ্রন্থ ও গবেষণা জার্নাল এবং প্রবন্ধ ও নিবন্ধ অধ্যয়ন করেছেন। তা ছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা আইন বিষয়ে একজন প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি তাঁর সে মেধা ও জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যে সব মূল্যবান টীকা তিনি সংযোজন করেছেন সেগুলোতেও পাঠক অনেক খোরাক পাবেন। তবে লেখকের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং লেখায় তার প্রতিফলন ঘটবে এটি খুবই স্বাভাবিক। আলোচ্য কোন কোন বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অথবা বক্তব্যের সঙ্গে পাঠক যদি একমত না হন তবে তা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়; এমন হতেই পারে। দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী পাঠক অনেক কিছু জানার ও বোঝার এবং নিজে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাবেন বলেই আমি মনে করি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

- মুহাম্মদ রাশেদ
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার
'সার্চ' SURCH (এ হাউজ অব সার্ভে রিসার্চ)